ভোরের কাগজ

তারিখ ... FEB 06 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডিজাইন : শ্যামল বসাক

ভোরের কাগজ ঢাকা ● রোববার ● ২৪ মাঘ ১৪০৬ ● ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০০

বইমেলার হওয়া না হওয়া

মফিদুল হক

বইমেলা লোকারণ্য মহাধুমধাম। তদুপরি এবার যোগ হয়েছে বিশ্বমাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য। উৎসব আয়োজনে এমনিতেই বাঙালি সরগর, তায় বাড়তি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি! বাঙালিকে আর পায় কে? তবু এই আনন্দঘন মুহূর্তগুলোই বোধ হয় সবচেয়ে উপযুক্ত সময় নিরানন্দ কিছু কথা স্মরণ করার। কেননা ঢাকের বাদ্যি তো বাজে উদ্বেলিত সকলকে একত্র হওয়ার আহ্বান জানিয়ে, উৎসব আয়োজিত হয় সম্মিলিত কিছু অঙ্গীকার বহন করার জন্য। তাহলে, প্রশ্ন তো থেকেই যায় কেন আমরা মিলিত হবো অমর একুশের গ্রন্থমেলার প্রাণ সম্মিলনীতে? অবশ্য উত্তরও এতো স্বতঃসিদ্ধ, এতো নিবিড়ভাবে আমাদের জানা যে, প্রশ্নটাই অবান্তর বোধ হতে পারে। একুশকে অবলম্বন করে বইমেলা, আর এই বইমেলাকে ঘিরে লেখক-পাঠক-প্রকাশক-গ্রন্থপ্রেমীদের বিপুল মাত্রার একত্র সমাবেশ; এই আয়োজনের পিছনে তো কেবলই বাণিজ্যবুদ্ধি নেই, শুধু বাংলা একাডেমী নেই, এমন কি একান্তভাবে বইয়েও তা সীমিত নেই, তাহলে এমন ব্যতিক্রমী আয়োজন সমাজে গড়ে উঠলে তার চেয়ে আনন্দবহ আর কি হতে পারে!

প্রশ্নটা আসলে আয়োজন নিয়ে নয়, এই যে এক ব্যতিক্রমী সমাবেশ, প্রতি বছরই যার আয়তন ও উল্লাস বৃদ্ধি পাচ্ছে তা কতোটা গভীর প্রভাব মেলতে পারছে সেই জিজ্ঞাসা তো থেকেই যায়। তদুপরি বিশ্বমাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়েছে আমাদের একুশে, দুনিয়ার তাবৎ ভাষা, বিশেষভাবে ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষা, তাদের অধিকারের কণ্ঠ সোচ্চার করে তুলবে একুশে ফেব্রুয়ারিতে, আমাদের জন্য এটা যতো না গর্বের তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুভার দায়িত্বের। ভাষার অধিকার যে জাতি রক্ত দিয়ে অর্জন করেছে, যে প্রতিরোধের পথ বেয়ে নিজস্ব জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তুলেছে, সেই অধিকার কতোটা সম্প্রসারিত করা গেছে সমাজে? সাক্ষরতার হার বিচারে যে দেশটি একেবারেই নিম্নবর্গীয়, স্বাধীনতার প্রায় তিন দশক পার হয়ে এলেও, সাড়ম্বরে একবিংশ শতকে প্রবেশ করলেও যে দেশের অর্ধেক মানুষ এখনও নিরক্ষর, সে দেশ তো তার নাগরিকদের জন্য মাতৃভাষার অধিকারকে একেবারে সংকুচিত করে রেখেছে। চাঁদের আলোকিত পিঠে যে উজ্জ্বলতা, শিক্ষার সুযোগ যাদের ক্ষেত্রে লভ্য হচ্ছে সেখানেও পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গুণের যে পতন ঘটছে সেটাও তো ভয়াবহ। শিক্ষার মানের কোনো জাতীয় বিস্তৃতি নেই, খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে মানের ক্ষেত্রগুলো, প্রতিভা যেন জড়ো হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানে, যে বিদ্যায়তনগুলো একান্তভাবে রাজধানীকেন্দ্রিক এবং প্রায় সর্বাংশে ধনবানদের অথবা ক্ষমতাবলয়ে অবস্থিতদের অধিগত। সারা দেশের নবীন প্রতিভার দেখা কেবল কয়েকটি কেন্দ্রেই মিলবে, এটা বিপুলসংখ্যক দেশবাসীর জন্য অপমানস্বরূপ। পাশাপাশি বিদেশী আরেক পাঠক্রম জোরদার হয়ে উঠছে, স্বদেশ-বাস্তবতা থেকে দূরত্ব তৈরি করা আন্তর্জাতিক মানের বিদ্যাপ্রাপ্তি কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা উপযুক্ত মূল্য পরিশোধে সক্ষম।

মাতৃভাষা দিবস মাতৃভাষা বিষয়ে অনেক দায়িত্বকে মুখ্য করে তুলেছে। এক্ষেত্রে তাই কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে, মাথায় ক্যাপ পরে, রং-বেরঙের ফেস্টুন হাতে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠার অবকাশ বিশেষ নেই। মাতৃভাষাকে সমাজে মহিমান্বিত আসন জোগাতে অনেক ধরনের সাধনা দরকার। সেসবের দিকে দৃষ্টি কতোটা ফেরাতে পারলো একুশে বইমেলা সেটা এক প্রশ্ন বটে। চরিত্রলক্ষণ হিসেবে বলা যায়, বইমেলা নিয়ে মাসব্যাপী যে বিপুল আলাপ-আলোচনা চলে, পত্রপত্রিকায় দৈনিকে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তার সিংহভাগজুড়ে থাকে ফিকশন বই, গল্প-কবিতার গল্প। জাতির মননভূমিতে ফিকশনের গুরুত্ব কোনো দিক দিয়েই কম নয়। কিন্তু গ্রন্থভুবন তো আরো অনেক ব্যাপক। আর এই ব্যাপকতা বরাবরই বিবেচনার বাইরে থেকে যাচ্ছে। পত্রপত্রিকার দৈনিক আলোচনা আবর্তিত হতে থাকে মুখরোচক সংবাদ নিয়ে, লেখককে তারকায় পরিণত করার এক ক্লান্তিহীন ব্যর্থ প্রয়াসে যেন মেতে উঠে সবাই। অথচ কতো রকম কাজই না সমাজে চলে আর বইমেলার শত রমরমা সত্ত্বেও এইসব নিভৃত সাধক অন্তরালেই থেকে যান। উদাহরণত উল্লেখ করা যায় এম আকবর আলীর কথা, 'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান' গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তাঁর কিছুটা খ্যাতি জুটেছিল এবং বিদ্যার্থীদের পাঠ সংকলনে তাঁর একটি-দুটি নিবন্ধ যোগ হওয়ায় নামটি হয়তো খুব অপরিচিত ঠেকবে না অনেকের কাছে। ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন পাবনার গোপালপুর গ্রামের দরিদ্র পরিবারের এই মেধাবী সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালেই শিক্ষকরা তাঁকে উৎসাহিত করেছিল মধ্যযুগের বিজ্ঞান সাধনায় মুসলিম অবদান বিষয়ে গবেষণা করার জন্য।

গ্রিক সভ্যতা-পরবর্তী ইউরোপ অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেও মানবের জ্ঞানসাধনা অব্যাহত ছিল অন্যত্র এবং জ্ঞানের নতুন ভূমিতে পদপাত ঘটেছিল ইসলামি জাগরণের সূত্র ধরে। এই মুসলিম সাধনাই পরবর্তীকালের ইউরোপীয় রেনেসাঁর বীজ জুগিয়ে মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। ইউরোপীয় ইতিহাসকাররা দীর্ঘকাল এই অবিচ্ছিন্নতাকে আড়াল করে নিজেদের অন্ধত্বকে সভ্যতার অন্ধতার সমার্থক করে রেখেছিল। সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায় জ্ঞান সাধনার পরম্পরা স্বীকৃতি পেতে শুরু করলেও অনুসন্ধিৎসু আকবর আলী অনেক আগেই এর মূল সূত্র অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাঁর 'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান' তাই কোনো ধর্মগোষ্ঠীর বিশেষ অবদানের কথা নয়, মানবের জ্ঞানসাধনার একটি বিশেষ পর্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ যেটা না জানলে জ্ঞানের ধারাবাহিক ইতিহাসই অজানা থেকে যাবে। স্মরণ করা যেতে পারে এই গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডের ভূমিকা লিখেছিলেন ড. কুদরাত-এ-খুদা এবং তৃতীয় খণ্ডের ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তবে যেটা আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে, ৭ হাজার পৃষ্ঠায় ১২ খণ্ডে অঙ্কশাস্ত্র, রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ভূগোলে মুসলিম জ্ঞানসাধনার বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন এম আকবর আলী, স্বউদ্যোগে এইসব গ্রন্থ প্রকাশও করেছেন এবং আরো চার খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। পাঠকপ্রিয়তার প্রত্যাশা তিনি করেননি, সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে মুষড়ে যাননি, এবং দূরে ভবিষ্যতের এক জাগ্রত সমাজের দিকে তাকিয়ে নিজের কাজ করে চলেছেন। ঢাকা শহরেই এই ৯০ বছরের বৃদ্ধের বাস, এখনও প্রতিদিন ডুবে থাকেন পঠন-পাঠনে এবং ভাবনাকে সংহত করে লিপিবদ্ধ করেন পাণ্ডুলিপিতে। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'অনুসন্ধিৎসার প্রেরণা-ধর্মগ্রন্থে' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৮ সালে। বিজ্ঞান ও ধর্মচিন্তার সমন্বয়ে বিশ্বাসী মুক্তমনের বৃদ্ধ তপস্বী লিখেছেন যে, ধর্ম শুধু পরকালের পথ প্রদর্শী নয়, বরং জাগতিক বাস্তব সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার প্রেরণাও ধর্মগ্রন্থে বহুভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে জ্ঞান সীমিত বলে তিনি কেবল কোরানের আয়াত আলোচনা করে সেই সত্য উদঘাটনে ব্রতী হয়েছেন। এই কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত কোরানের দুই তফসিরকারক মওদুদী ও মুফতী শফির ব্যাখ্যার দৈন্য তিনি উন্মোচন করেছেন। বইমেলা নিয়ে গোটা জাতির হৈহল্লোড় শুরু হতে যাচ্ছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় জ্ঞানসাধনায় মৌলিক গ্রন্থ রচয়িতা এই অসাধারণ মানুষটি তো আড়ালেই ছিলেন এবং আড়ালেই রয়ে

● এরপর ১৫ পাতায়